১৫-০৩-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই এই পাঠশালা এমনই আশ্চর্যের যেখানে জ্ঞান-সাগর পতিত-পাবন বাবা স্বয়ং জ্ঞান-অমৃত খাইয়ে পবিত্র বানিয়ে দেন। এমন পাঠশালা আর একটিও কোথাও খুঁজে পাবে না সমগ্র দুনিয়াতেও"

প্রশ্ন :- বাবার কোন্ পরামর্শটি মেনে চললে প্রতি মুহূর্তেই বাবা তোমার সাহায্যকারী হবেন ?

উত্তর :- বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন, জিন্ (ভূত) -এর মত লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা সবকিছুতেই যেন বুদ্ধির যোগ এক বাবার সাথেই সংযুক্ত থাকে। জাগতিক অন্য সবকিছু থেকেই নিজের বুদ্ধিকে সরিয়ে নিতে থাকো। কেবলমাত্র বাবা আর স্বর্গরাজ্যেকে স্মরণে রাখার সেবা করে যাও। বাবার প্রতি এটাই হলো বাচ্চাদের সহযোগীতা। এই স্মরণের যোগ-ই তোমদের স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানায়। সত্যি কত সুলভ এই আদান-প্রদান। নিজে সাহসী হলে প্রতিটি মুহূর্তেই বাবারও সাহায্য পাবে। তাই তো বলে- "হিম্মতে মর্দা মদতে খুদা" - অর্থাৎ নিজের সাহস থাকলে, ঈশ্বরও সাহায্যের হাত বাড়ায়।

গীত :- আমাকে যিনি কদমে কদমে
দিয়েছেন সাহার
তাঁকে হৃদয় ভরে
জানাই ধন্যবাদ

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, তোমরা গীত তো শুনলে! কিন্তু, তোমাদেরকে "বাচ্চা-বাচ্চা" বলে এইভাবে কে সম্বোধন করেন ? বাচ্চা বলে ডাকছে যখন, তবে তো অবশ্যই উনি সেই বাচ্চার বাবা-ই হবেন। যদিও সমগ্র দুনিয়াই জানে, এমনভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে "বাচ্চা" ডাকতে পারেন একমাত্র পরমপিতা। যাকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা হয়। আর তোমরা সব আত্মারাই ওনার সন্তান। আর বাচ্চারা, তোমরাও এই পাঠশালায় আসো জ্ঞানের-পাঠ পড়তে - মনুষ্য থেকে দেবতা হবার লক্ষ্যে। যেহেতু তোমাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তাও আছে, অসীম-বেহদের বাবা স্বয়ং এই পাঠ পড়াচ্ছেন তোমাদেরকে। একদিকে তিনি যেমন পিতা, তার সাথে সাথে তিনি আবার শিক্ষকও বটে। তাই এমন মাতা-পিতার সন্তানও অনেক। তোমাদের মধ্যেই অনেকে আবার অনেক উচ্চ-পদের অধিকারীও হতে থাকবে। যেখানে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদেরকে তার সামনে বসিয়ে পড়াচ্ছেন। সত্যি, খুবই আশ্চর্যেরও এটা। এমন সুন্দর আশ্চর্যের বিচিত্র পাঠশালা আর কোথাও হয় না। বাচ্চারাও তেমনি জানে, জ্ঞান-সাগর যিনি পতিত-পাবন বাবা উনি স্বয়ং সেই জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে বাচ্চাদের পবিত্র বানাবেন। তাই তো তারাও বাবার এত মহিমার কীর্তন করতে থাকে - "ওগো পতিত পাবন বাবা, এসো তুমি।" তবে তো এমনই দাঁড়ালো, বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন পতিত দুনিয়াই। আবার পবিত্র দুনিয়া বলেও তবে কিছু আছে নিশ্চয়। নতুন দুনিয়া, নতুন ঘর-দুয়ারকেই পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। যা ক্রমে ক্রমে পুরোনো হতে থাকে। তাই বাচ্চারাও বুঝতে পারছে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা যা এখন এই এত পুরোনো দুনিয়া, একদা তা নতুন দুনিয়াই ছিল,- যেখানে ছিল অপার সুখ-শান্তি।

বাচ্চারা, তোমরা যে গীত শুনেছো, তা তো ভক্তি-মার্গের। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তো রয়েছো তার মর্মার্থের ব্যবহারিক সম্পর্কে। তাই ভক্তি-মার্গের এই গীতের নির্যাসকে বাস্তবে তোমরাই ধারণ করো প্রকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে। বাচ্চারা, তোমরা তো এটাও জানো যে, বাবা এসেছেন সবাইকে আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। একমাত্র তিনিই যখন পতিত-পাবন, সেক্ষেত্রে উনিই তো পবিত্র বানিয়ে তবেই নিয়ে যাবেন সেই পবিত্র দুনিয়ায়। নিজেরা নিজেদের মনে এ ধরণের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকবে। বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন অবশ্যই পতিত অর্থাৎ পাপের দুনিয়া। তাই পবিত্র দেবতাদের এবং পবিত্র সাধু-সন্ন্যাসীদের নমন করে পতিত মানুষেরা। যদিও পতিত-পাবন তো এক ও একমাত্র এই বাবা-ই। প্রকৃত অর্থে সবাই সেই একই পবিত্র বানাবার কারিগরকেই কিন্তু স্মরণ করে থাকে, যেহেতু একমাত্র উনিই পারেন দুনিয়ার জাগতিক দুঃখ-কষ্ট থেকে সবাইকে মুক্ত করতে। আর এটাই এই বাবার কর্ম-কর্তব্য। কিন্তু বাচ্চারা- তোমাদের এই দুঃখ-কষ্ট ঘটেই বা কি কারণে ? --বিকার। তবে এই বিকারগুলির আবার কি কি নাম ? -- কামের ভূত, ক্রোধের ভূত, অশুদ্ধ অহংকারের ভূত। শরীরকেও কিন্তু ভূত বলা হয়। কারণ, ৫-ভূতের তত্ব দ্বারাই যে গঠিত এই শরীর। কিন্তু, আত্মা এসব থেকে আলাদা। সে এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীর গ্রহন করে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের দৃষ্টি এখন নতুন দুনিয়ার দিকে। আর সেই জ্ঞানই অর্জনের পাঠ পড়ছো তোমরা। জাগতিক মানুষেরাও তা জানে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহও লাগবে অচিরেই। কিন্তু তারা তো এটাই জানে না যে, তারপরে কি ঘটতে চলেছে। যেহেতু অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা গীতার ভগবানের উপস্থিতি দ্বাপরে এমনটাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে শাস্ত্রগুলিতে। রাজযোগ তো কেবলমাত্র সেই এক ও একমাত্র গীতার ভগবান-ই শেখান। কৃষ্ণ যা শেখাতেই পারবে না। অথচ শাস্ত্রকারেরা গীতায় দ্বাপরে কৃষ্ণের নাম লিপিবদ্ধ করেছে। ফলে মানুষেরাও কিংকর্তব্য-হতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা, তোমরাও এতদিম তাতেই বিভ্রান্ত হয়েই ছিলে, কিন্তু এখন এসবের প্রকৃত তথ্য জেনে তা থেকে বেড়িয়ে আসতে পেরেছো। যার ফলে মানুষদের এত দুর্গতি ভুগতে হলো। কিন্তু এখন এই জ্ঞান অর্জনের ফলে তোমাদের সদগতির দিন শীঘ্রই আসতে চলেছে।

বাবা স্বয়ং এখন জানাচ্ছেন, একমাত্র উনি-ই জ্ঞানের-সাগর, অন্য আর কেউ-ই এই জ্ঞান দিতে পারেন না। তাই জ্ঞান-সাগরও কেবল একজন বাবাকেই বলা হয়। সেই জ্ঞান আবার জ্ঞান-গঙ্গাদের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যাদের আবার "শিব-শক্তি জ্ঞান-গঙ্গা" বলা হয়। পার্থিব গঙ্গা দিয়ে তো ক্রমান্বয়ে জলের ধারাই প্রবাহিত হতে থাকে। আর তা এমনও হতে পারে না যে, তারর ধারা যেখানে খুশী সেখানেই পৌঁছতে পারবে। --অবশ্যই নয়। কিন্তু তোমরা জ্ঞান গঙ্গারা, তোমাদের ইচ্ছা-মতন যেখানে খুশী সেখানে গিয়েই লোকেদেরকে জ্ঞানের বাণীর বর্ষণ করতে পারো। তোমরা যেখানেই পৌঁছোবে, সেখানেই জ্ঞান-গঙ্গা প্রকট হবে। লোকেরা তো এমনও করে, যেখানেই জলের গঙ্গার উৎসমুখ দেখে সেখানেই একটি করে গোমুখ বানিয়ে দেয়। কিন্তু, বাস্তবের গোমুখ তো তোমরা বি.কে.-রা। তোমাদের এই গোমুখ থেকেই তো সেই জ্ঞানের ধারা বইতে থাকে। জ্ঞান-সাগর শিববাবার বি.কে. বাচ্চারা, প্রকৃত অর্থে তোমরাই সত্যিকারের জ্ঞান-গঙ্গা। একমাত্র তোমাদেরই বোঝানো হয়ে থাকে সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। তাই এই এক বাবাকেই নলেজফুল বা জ্ঞানী বলা হয়। যিনি বিশ্ব-চরাচরের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। একমাত্র তিনিই সব বেদ ও সর্বপ্রকার গ্রন্থকে সম্পূর্ণ রূপে জানেন। সেসব কিছুর সার-নির্যাসকেই তিনি ব্যাখ্যা করে শোনান। সব ধর্মেরই একটা করেই শাস্ত্র-গ্রন্থ হওয়া উচিত। যেমন, শ্রীমদ ভগবৎ গীতা, বাইবেল-ও তো একটাই। ইব্রাহিম এসে ওনার ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেন। কিন্তু তারও আগে ও পরে অন্যেরাও তো আসে-যায়। তাই

তারাও যা কিছু বলে সেগুলিকেই পরে ধর্ম-শাস্ত্রের রূপ দেয়। কিন্তু প্রধানের বাণী শোনাবার সাথে সাথেই তা করে না। যদিও ইতিমধ্যে তার ধর্ম স্থাপনাও হয়ে যায়। কিন্তু সেই সব শাস্ত্রগুলিই পরে ধর্ম-গ্রন্থের রূপরেখা পায়। বাবা জানাচ্ছেন, এইসব বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র, জপ, তপ, নানান পদ্ধতি- সবই ভক্তি আর বিশ্বাসের। কিন্তু বি.কে.-দের এই জ্ঞানের পাঠ তো গভীর জ্ঞানের। তাই এখন যখন ভক্তির দিন শেষ হয়ে এসেছে, বাবা এসেছেন জ্ঞানের মাধ্যমে পতিতদের পবিত্র বানাতে। তোমরা বি.কে.-ব্রাহ্মণেরা এখন জেনেছো, একমাত্র তোমরাই সেই ব্রাহ্মণ, যারা আগামীতে দেবতা হতে চলেছো। ৮৪-জন্মের পুরো হিসেব-নিকেশও রয়েছে তোমাদের বুদ্ধিতে। তোমরা এখন ব্রহ্মার মুখকমল দ্বারা স্বীকৃত ব্রাহ্মণ। সেই তোমরাই, পূর্বে যারা শূদ্র-কূলের ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কূলের হয়েছো। যার অর্থ কেবল তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই জানো। তোমরা ছাড়া আর অন্য কেউ-ই দেবী-দেবতা ধর্মের নয়। যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে, তারা তো এটাও জানে না যে, আসলে তারাই ছিল দেবী-দেবতা ধর্মের। এমন কি এটাও উপলব্ধি করে না, বর্তমানে তারাই এখন শূদ্র কূলের হয়েছে। নিজেদের প্রকৃত ধর্ম ভুলে গিয়ে, ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে কাঙ্গালে পরিণত হয়েছে। তাই বাবা তোমাদের "হাম্ সো - সো হাম্"- এর মর্মার্থ বোঝাচ্ছেন। 'হাম সো'- অর্থাৎ আমরা আত্মারা পরমধাম নিবাসী। এখানে আসি আমাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় (পার্ট) করতে। নির্দ্দিষ্ট দেব-কূলের আত্মারা প্রথমে আসে। ক্রমান্বয়ে আসে বৈশ্য ও শূদ্র কূলের। বর্তমানের এই বি.কে -রাই আবার যাবে দেবতা কূলে। বাচ্চারা, তোমরা তো তা জানো, কোন কূলে তোমাদের কতবার করে জন্ম হয়। বাবার তো আর অত সময় নেই যে প্রতিটা জন্মের অত বিস্তারিত তথ্য জানাতে থাকবে। তাই বাবা কেবল সার-সংক্ষেপটাই বলেন। যেমন বৃক্ষের বীজকে জানলেই তার বিস্তারকেও জানা যায় অর্থাৎ বৃক্ষের সবকিছুই বোঝা যায়। (বাবাকে জানলেও সৃষ্টি-চক্রের কল্প-বৃক্ষকেও জানা যায়)। এই বাবাই হলেন সৃষ্টিরূপী কল্প-বৃক্ষের বীজ। আর মনুষ্য জগতের সবাই সেই বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, ডাল-পালা, পাতা-লতা।

এই দুনিয়ায় আমরা আসি সেই পরমধাম থেকে। নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট-অভিনয় করতে। বাচ্চারা, কেবলমাত্র তোমরাই আসতে পারো সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে। চিত্রপট অনুসারে তোমাদের সেই সত্যযুগ থেকে ক্রমান্বয়ে পার্ট চলতেই থাকে। অন্যান্য ধর্মের আত্মারা আসে তাদের নিজ নিজ সময় অনুসারে। অন্তিমে যখন বিনাশ-পর্ব হয়, তখন সব আত্মারাই ফিরে যায় আত্মাদের নিজ-ধামে। আবার তাদের নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর অনুসারে যে যার নির্দিষ্ট কর্ম-কর্তব্য পালনের জন্য আসে নিজ নিজ ধর্মের স্থাপন করতে। এসব রহস্য তো তোমদের বুদ্ধিতে পাকাপোক্ত হয়েই আছে। বাচ্চারা, তাই তো তোমরাও বলো - "বাবা যেভাবে যাকিছু তুমি পড়াচ্ছো-শেখাচ্ছো, তাতে অবশ্যই আমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিকানা পাবোই পাবো। তোমার মতন এমন সুখ-শান্তি আর কেউ দিতে পারে না। মানুষেরা তো কেবল অল্প কালের সুখ দিতে পারে। যা জন্তু-জানোয়ারও দিতে পারে। অথচ, 'মনুষ্য জীবন অমূল্য জীবন'- এ কথাই তো বলা হয়। এই মানুষেরাই তাদের দৈবী গুণে দেবী-দেবতা হতে পারে। মানুষই চাইলে সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হতে পারে। কিন্তু, বাবা তুমি যে সুখ-শান্তি দিয়ে থাকো, তা আর কেউ দিতে পারে না। তুমিই সে, যে আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাও। তুমি যে বিশ্ব চরাচরের রচয়িতা।" অথচ বাচ্চারা দেখো, তোমাদের কেবল একটা কাজই করতে হয় - বাবাকে স্মরণ করা। ব্যস্ এটুকুই যা, কোনও প্রকার হঠ-যোগ ইত্যাদিও করতে হয় না। এমনই বাবার বাচ্চা তোমরা। এখন তো তা ভালভাবেই জেনেছো, এই বাবা-ই নতুন বিশ্বের রচয়িতা। আর বাবা আসেনও সেই কত দূরের পরমধাম থেকে। এমনই প্রিয় থেকেও প্রিয়তম

বাবা ইনি। তাই সবাই কেবলমাত্র তাকেই স্মরণ করে। তা সে যে কোনও ধর্মের লোকই হোক্ না কেন, সবারই ঈশ্বরীয় পিতা একমাত্র তিনি। কেউ বা বলে ভগবান আবার কেউ বা বলে আল্লাহ্। কিন্তু ডাকে তো সেই একজনকেই। বাবা-ও তেমনি জানান, উনি আসেন সবাইকে সুখ-শান্তির আশীর্বাদী-বর্সা দিতে। তাই তো ভক্তি-মার্গের লোকেরাও ওনাকেই স্মরণ করে। আর এমন দুঃখের সময়েই আবার ওনাকে আসতে হয়, সবাইকে সুখ-শান্তির আশীর্বাদী-বর্সা দিতে। এরপর অর্দ্ধ-কল্প আর কারও ওনাকে স্মরণ করতে হয় না। যেহেতু সেই সময়ে তো আর মায়া থাকে না যে লোকেদের দুঃখ-কষ্ট দেবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন দেব-দেবী হয়ে সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। অতএব তোমাদের হৃদয়ে রাত-দিন তেমন ভাবনাই থাকা উচিত - বাবা, তুমিই আমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছো। আর তাতে আমাদের অধিকারও আছে। বাবা যেখানে বিশ্বকে নতুন স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করছেন, সেখানে বি.কে.-বাচ্চাদেরকেই তো তার মালিক বানাবেন অবশ্যই। এমন তো আর হতে পারে না, ঈশ্বরীয় পিতা স্বর্গ-রাজ্য রচনা করবেন, আর তার সন্তানেরা সেই স্বর্গ-রাজ্যে থাকবে না। কিন্তু আবার সবাই যদি স্বর্গ-রাজ্যে যায়, তবে তো অচিরেই তা নরক-রাজ্যে পরিণত হবে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী নাটকটাই যে হার-জিত ও সুখ-দুঃখের খেলা। সেই নতুন দুনিয়াও আবার পুরোনো দুনিয়াতে পরিণত হবে। কিন্তু দুনিয়াকে কে এমন নতুন বানায়, আর পুরোনোই বা বানায় কে ? আবার এই সৃষ্টি-চক্রের পরিবর্তন বা কিভাবে হয় ? এসব অবশ্যই তোমাদের মন-বুদ্ধিতে রাখতে হবে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে যেমন থাকে সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী রাজত্ব। তারপর দ্বাপর থেকে আরও অন্যান্য ধর্মের উত্থান হতে থাকে। ঠিক যেমনটি পূর্ব কল্পে ঘটেছিল, একই ভাবে তারই প্রতিটি ঘটনাই পুনরাবৃত্তি হবে।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো শীঘ্রই আবার সত্যযুগের সূচনা হতে চলেছে। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপন হবে। মানুষেরা ভাবে যে, এই পুরোনো দুনিয়া হয়ত আরও অনেক পুরোনো হতে থাকবে। এই দুনিয়ার আয়ু এখনও অনেক বাকী। তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন, তারা এখনও ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। বিনাশ যে এখন দোড়গোড়ায়। তাই তো বাবা এসেছেন, এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে। আর এইসব কর্ম-কর্তব্য করার জন্য আগে তো কেউ ছিল না। কিন্তু এখন তোমরা বি.কে.-রা তা হয়েছো, যারা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা ওনার দত্তক সন্তান হয়েছো। যেহেতু উনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাই ওনার বহু সংখ্যক বাচ্চাই তো হবে। তারাই বাবার সামনে বসে পাঠ গ্রহণ করে আবার দেবতা হতে চলেছে। পবিত্র হয়ে স্বদর্শণ-চক্রধারী হবার প্রতিজ্ঞা যে বচ্চা বাবার সামনে করে তা পালন করে, কেবলমাত্র সেই বাচ্চারাই রাজ্য-ভাগ্য লাভ করে। সব বাচ্চা অবশ্য তাতে সফল হয় না। অন্যান্যরা তাদের কার্য-করণের হিসাব অনুযায়ী নিজের নিজের কর্মফল অনুসারে হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে তারপরেই ফিরতে পারবে। বাবা আবার করে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। তার পরেই অন্যান্য সব ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যায়। মহাভারতের সেই মহাভারী যুদ্ধ এবার শুরু হলো বলে। কল্প-চক্রের ইতিহাস-ভূগোলের এই রহস্যগুলি গীতার ভগবান স্বয়ং সামনে বসে তা শোনান। ভগবানের মহিমা একপ্রকার আর কৃষ্ণের মহিমা অন্যপ্রকার। দুজনের মহিমা একেবারেই আলাদা। কৃষ্ণকে তো আর বলা যাবে না যে কৃষ্ণ মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সর্বশক্তিমান, সর্বময়কর্ত্তা। সর্বশক্তিমান-সর্বময়কর্ত্তা তো কেবল একজনই হতে পারে - যিনি শিববাবা। যেমন সূর্যবংশীদের মহিমা একপ্রকারের আর চন্দ্রবংশীদের মহিমা অন্যপ্রকারের। তেমনি বৈশ্য আর শূদ্রবংশীদের মহিমাও আলাদা আলাদা প্রকারের। প্রত্যেকেরই তাদের নিজের নিজের পৃথক মহিমা হয়। কেউ যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়, তখন তাকে মুখ্যমন্ত্রীর রীতি-নীতির আচরণ-বিধি পালন করতে হয়।

রাজ্যপালের ক্ষেত্রেও রাজ্যপালকেও রাজ্যপালের নিয়মেই চলতে হয়। সবাই তো এক সমান মার্যাদায় থাকবে না। এসবও বোঝার ব্যাপার আছে। লোকেরা তো এ কথাটাই জানে না যে তোমরা বি.ক.-রাই এই ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বানাবার কার্য করে চলেছো। বাচ্চারা, গুপ্তরূপে তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য তা স্থাপন করে চলেছো কোনও প্রকার হিংসা-অশান্তি ছাড়াই। না তো এখানে আছে কোনও প্রকার কাম-বিকারের হিংসা, এমনও নয় যে এখানে কোনও মারামারি বা লাথি-ঘুঁষির ঘটনা ঘটে। আর গোলা-গুলি চালিয়ে একে অপরকে হত্যা করার মত হিংসা থেকে তোমরা তো শত যোজন দূরেই থাকো। যেহেতু, তোমাদের কোনও প্রকারেরই হাতিয়ারের দরকার নেই।

তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা জেনেছো, এই বাবার সাহায্যের দ্বারাই গত কল্পের মতন বর্তমানের এই কানাকড়ির ভারতকেই হীরে তুল্য করে বানাচ্ছো তোমারা। এটাই প্রকৃত ঈশ্বরীয় সেবা। কিন্তু জগতের মানুষেরা তো কেবল জাগতিক সেবাই করে থাকে। আর তোমরা বাচ্চারা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে এমনই শ্রেষ্ঠ হচ্ছো। আর অন্যেরা মনুষ্য মত অনুসারে কেবল ভ্রষ্টই হচ্ছে। ফলে তাদের অধোগতিও হচ্ছো। ভক্তি-মার্গ-ও শুরুতে অব্যভিচারী ছিল। তখনকার ভক্তি-মার্গ অতি সুন্দর ছিল। তখন তারা কেবল একেরই (শিবের) পূজা করত। দ্বিতীয় ধাপে তারা দেবতাদের পূজা করতে শুরু করে। তারপর একসময় এমনই অবস্থায় পৌঁছায় যে, কুকুর, বিড়াল, পাথর, মাটি এমনকি ৫-তত্বকেও ভক্তি করতে শুরু করল। একেই বলা হয় ব্যাভিচারী ভক্তি। এই ভাবেই লোকেরা অব্যাভিচারী থেকে ব্যাভিচারী হয়ে পড়ে। এমন সময়ে বাবা এসে তোমাদেরকে অব্যাভিচারী যোগ-বিদ্যা শেখাতে শুরু করলেন। ঘর-সংসারের গৃহস্থলী ব্যবহারে থেকেই, যাবতীয় কর্ম-করার সাথে সাথেই কেবল বাবাকে আর ওনার আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণ করে যেতে হবে। পরিশ্রম বলতে যা কিছু, তা কেবল এই। নিজের ঘরে যাও বা অন্য কোথা থেকে আসো, গুপ্ত রীতিতে কেবল তা বুদ্ধিতে ধারণ করে স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। শব্দ করে রাম-রাম কিম্বা শিবায়ঃ নমঃ - এসবও উচ্চারণ করার দরকার নেই। লাগাতর কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তো গুপ্ত, অথচ জ্ঞানের-সাগর। এই চরাচর সৃষ্টি-চক্রের সবকিছুই ওনার জ্ঞাত। তাই একমাত্র ওনাকেই বলা হয় পরমাত্মা। উনিও (ব্রহ্মাও) এক আত্মা। সেই পরমাত্মা বাবার থেকেই উনি সরাসরি জ্ঞান পেয়ে থাকেন। এইসব বিষয়গুলিকে ধারণ করে, তারপর অন্যদেরকেও তা ধারণ করাতে হবে। হতভাগ্য লোকেরা দিশার খোঁজ করতে থাকে, কিন্তু তারা তার খোঁজ পায় না। কিন্তু তোমরা তো জানো, শান্তিধাম-ই প্রকৃত নির্বাণধাম। আমরা আত্মারা যেখান থেকে আসি।

স্বর্গকে বলা হয় সুখধাম আর নরক হলো দুঃখধাম অর্থাৎ মায়াপুরী। স্বর্গ-ধাম অর্থাৎ বিষ্ণুপুরী, আর বর্তমানের এই জগৎ-টা নরকের রাবণপুরী। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা কেবল তোমাদের এই বাবা আর ওনার আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণ করতে থাকো। ব্যস্ এইটুকুই যা। আর তোমাদের বুদ্ধি যদি এদিক-ওদিক চলে যায়, তবে সেইসব দিক থেকে নিজেকে সরিয়ে আনো। খাওয়া-নাওয়া, চলতে-ফিরতে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো, এটাই সহজ-সরল পন্থা। ধরো, বিলেতে কোনও সাহেব আছে, আর তার মেমসাহেব আছে হিন্দুস্থানে - যদিও তাদের দুজনের অবস্থানের দূরত্ব অনেক হওয়া সত্ত্বেও মনের বুদ্ধিতে তো একে অপরকে স্মরণ করবেই। তেমনি আমরাও বাবার থেকে যতই দূরে থাকি না কেন, তবুও কিন্তু মন-বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কারণ এতেই আছে প্রকৃত সুখের দিশা। এছাড়া অন্য সবকিছুতেই কেবল দুঃখ-কষ্টই পাওয়া যায়। কোনও মনুষ্যই অন্য কোনও মনুষ্যকে সদাকালের সুখ দিতে পারে না। তাই বাবা বলছেন, জিন্ যেমন তার প্রভুকে লাগাতার

স্মরণ করতে থাকে, তেমনি তোমরাও জিনের মতন এই বাবাকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকো। ব্যস্, কেবলমাত্র বাবা আর বাবার আশীর্বাদী-বর্সা স্বর্গকে লাগাতর স্মরণ করতে থাকো। এটাই বাবার প্রতি তোমাদের বিশেষ সেবা। আর তোমাদের প্রতি বাবার সেবা হলো, তোমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যাতে তোমরা বাবার প্রতি লাগাতর স্মরণের সেবা করতে পারো। অতএব, বাবার এই সদুপোদেশ স্বীকার করে অঙ্গীকারবদ্ধ হও। সেটাই হবে বাবার সহযোগী হয়ে বাবাকে সাহায্য করা। "হিম্মতে মর্দা-মদতে খুদা"! অর্থাৎ তুমি নিজে সাহস করে এগোলে - ঈশ্বরও সাহায্যের হাত বাড়ায়। এই স্মরণের যোগ দ্বারাই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারো। সত্যি, কত সস্তায় পাওয়া যায় এত অমূল্য সম্পদ। অথচ, জাগতিক গুরু-গোঁষাইরা কতই না ধাক্কা-ঠোঁকর খাওয়ায় তোমাদেরকে। আর এখন যখন সেই এক ও একমাত্র সদগুরু স্বয়ং এসে হাজির, তখন তো আর কোনও গুরু-গোঁসাই করার প্রয়োজনই নেই। এই গুরু-গোঁসাইয়ের ব্যাপারটাই তো আর থাকে না তবে। সবারই সদগতি হয়ে যায় তখন। একমাত্র সেই সদগুরু আসার পর, অনেক গুরু করার রীতি-রেওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় আগামী অর্দ্ধ-কল্পের জন্য। আবার যখন ভক্তি-মার্গের শুরু হয়, তখন আবার সেই রীতি-রেওয়াজ শুরু হতে থাকে ধীরে ধীরে। তখন আবার ভক্তি-মার্গের রীতি-রেওয়াজে চলতে থাকে। সত্যযুগে গুরু বলে কিছু থাকেই না। সেখানে কারও অকাল-মৃত্যুও ঘটে না। ২১-জন্মের জন্য স্বাস্থ্য, সম্পদ আর খুশী সদাই থাকে। যা বাবা ছাড়া আর অন্য কেউ দিতেই পারে না। এই বাবার দ্বারাই তোমাদের সেই স্বাস্থ্য, সম্পদ ও খুশীর প্রাপ্তিযোগ হয়ে থাকে। বাদবাকী আর যারা, তারা তখন শান্তিধামে চলে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভারতকে হীরে-তুল্য বানাতে ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে। গুপ্ত রীতিতে বাবাকে স্মরণ করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

২) নিজের মনের সাথে কথা বলতে হবে। বাবার সাথেও তেমনি ভাবে কথা বলতে হবে- বাবা আপনি যে সুখ-শান্তি প্রদান করেন, তা আর কেউ-ই পারে না। বাবা, আপনার এই পঠন-পাঠনের দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে পারি আমরা। আপনি যে নতুন দুনিয়ার রচনা করছেন, সেই নতুন দুনিয়ার অধিকারী আমিও।

বরদান :- সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা স্থুল কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম ও নিয়ম মতন চালাতে পেরে স্বরাজ্য অধিকারী হও

বিস্তার :- সর্বাগ্রে নিজের সূক্ষ্ম শক্তিগুলির ফলাফলগুলিকে পরীক্ষা করে নিয়ন্ত্রণ কর। যে বিশেষ ভাবে মন-বুদ্ধি আর সংস্কারের উপরে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, তাকেই স্বরাজ্য অধিকারী বলা হয়। এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলিই স্থুল কর্মইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম আর নিয়মে চালাতে পারে। যে নিজের সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে যথাযথ পরিচালনা করতে পারে, সে অপরকেও তেমনি ভাবে পরিচালনা করতে

পারে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ এবং শাষন করার ক্ষমতা অর্থাৎ সবার প্রতিই যথার্থ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এসে যায়।

স্লোগান :- যার সাথে হাজার বাহুর বাবা আছেন, তার মনে কখনই হতাশা আসতে পারে না।